ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 02. No. 01. August 2009

পাবনা অঞ্চলের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও মুসলিম নিদর্শনাবলী :একটি সমীক্ষা

ড. মোহাম্মাদ ইদ্রিস*

[সারসংক্ষেপ : পাবনা অঞ্চলটি প্রাচীনকালে ভারতের বঙ্গ ও পুণ্ড্রবর্ধন প্রদেশদ্বয়ের অংশ বিশেষ ছিল। প্রাচীনকালে পাবনাসহ সমগ্র উত্তরবঙ্গ ও আসাম বাংলার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল পুণ্ড্র রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ঐতিহাসিক বিশেণ্ডষণ অনুযায়ী খ্রীষ্টপূর্ব চার'শ অব্দে রচিত কল্পসূত্র নামক গ্রন্থে প্রাচ্য দেশীয় জনগণ যে চারটি শাখায় বিভক্ত ছিল পুণ্ড্র তন্মধ্যে অন্যতম। এখানকার ভূ-প্রকৃতি সমৃদ্ধ করেছে এ অঞ্চলের সমাজ ও সংস্কৃতিকে। উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার হিসেবে খ্যাত, প্রাচীন পুণ্ড্র রাজ্যের অন্যতম ভূ-ভাগ পাবনা অঞ্চলটি আওলিয়া কেরামদের অসংখ্য স্মৃতি বিজড়িত গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম জনপদ। গাঙ্গেয়, যমুনা ও করতোয়ার পণ্ডাবনভূমির এ অঞ্চলে পলি জমে ধীরে ধীরে যেভাবে এ ভূখন্ডের সৃষ্টি হয়েছে, তেমনিভাবে এ অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও বিস্তৃতি ঘটেছে দীর্ঘ দিনের ধারাবাহিকতায়। প্রাচীনকাল থেকেই এ অঞ্চলের মানুষের রয়েছে ইসলাম প্রচারের সুদীর্ঘ ইতিহাস এ ছাড়া এ অঞ্চলের রয়েছে স্বতন্ত্র সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক পরিক্রমা। তাই কোন অঞ্চল সম্পর্কে জানতে হলে সে অঞ্চলের স্বতন্ত্র সামাজিক, রাজনৈতিক, ও সাংস্কৃতিক পরিক্রমা সম্পর্কে জানা একান্ত প্রয়োজন]

পাবনা অঞ্চলের পরিচিতি

অবস্থান: বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম অঞ্চল পাবনা। পৃথিবীর মানচিত্রে এ অঞ্চলটি ২৩°৪৮″ থেকে ২৪°৪৭″ উত্তর অক্ষাংশের মাঝামাঝি এবং ৮৯°০৩″ থেকে ৮৯°৫৬″ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।[১]

পরিসীমা: পদ্মা-যমুনার সম্মিলনে ত্রিভূজাকৃতিতে গড়ে উঠা বৃহত্তর পাবনা জেলার উত্তরে বগুড়া ও নাটোর জেলা, দক্ষিনে পদ্মা নদী সংলগ্ন ফরিদপুর ও কুষ্টিয়া জেলা, পূর্বে যমুনা নদী সংলগ্ন মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও জামালপুর জেলা এবং পশ্চিমে রাজশাহী ও নাটোর জেলা অবস্থিত।[২]

পাবনা অঞ্চল বাংলাদেশের সুসমৃদ্ধ জনপদ। এ জনপদের মানুষের রয়েছে ঐতিহ্যবাহী জীবনধারা। নিম্নে অত্র এলাকার মানুষের খাদ্য, পোষাক, অলংকার, প্রসাধনী, বাসগৃহ, আসবাবপত্র, ধর্মীয়-সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, অতিথি আপ্যায়ন প্রভৃতি অত্যাবশকীয় এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জীবনাচরণের বিচিত্র দিকগুলো তুলে ধরা হলো:

খাদ্য: অতীতে মাছ, ভাত ও দুধ ছিল পাবনা অঞ্চলের মানুষের দৈনন্দিন খাবার. ফলমূল ও বিভিন্ন প্রকার মিষ্টান্ন ছিল বিশেষ খাবার। ভাত হিসাবে আউস,[৩] আমন[৪], ধানের মোটা চালেরই বেশী প্রচলন ছিল।[৫] আম কাঁঠালের দিনে মুড়ি ও পান্ড়া খাওয়া চলত। অনেকে ছোট ছেলে মেয়ে ও মেহমানদের জন্য মুড়ি, মোয়া, খই, চিড়া, নাড়ু ইত্যাদি খাওয়ার ব্যবস্থা করত।[৬] অতীতে চাউলের ক্ষুদ দিয়ে জাঁউ সুদা, আতপ বা ভূরার চাউলের জাঁউ[৭] এবং গমের

---

* প্রভাষক, সাথিয়া ডিগ্রী কলেজ, পাবনা।

[১] পাবনা অঞ্চলটি প্রাচীন কালে ভারতের বঙ্গ ও পুণ্ড্রবর্ধন প্রদেশদ্বয়ের অংশ বিশেষ ছিল। বাংলাদেশের পুরাতন জেলাগুলোর মধ্যে পাবনা অন্যতম। শাসন ব্যবস্থার সুবিধার জন্য ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন রাজশাহী জেলার পাবনা, শাহজাদপুর, রায়গঞ্জ, মাথুরা, ও ক্ষেতুপাড়া এই পাঁচটি থানা, এবং যশোর জেলার ধরমপুর, মধুপুর, কুষ্টিয়া এই তিনটি থানা নিয়ে প্রথমে পাবনা জেলা গঠিত হয়। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে আবার ময়মনসিংহ জেলা থেকে দুটি থানা আলাদা করে পাবনার অন্তর্ভূক্ত করা হয়। দ্র: *L.S.S Omally, Bangal District Gazatter Pabna* (Calcutta: Bengal Sectraritratie Book Dipot, 1923), P-1, W.W. Hunter,*A Statrical Account of Bangle District of Murshidabad & Pabna*,Vol-IX (London:Trubner and Co, 1876), চ. ২৭০; শ্রী রাধারমন সাহা বি. এল, *পাবনা জেলার ইতিহাস* (পাবনা: গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৩০ বাং), পৃ: ১১; খন্দকার আব্দুর রহিম, *সিরাজগঞ্জের ইতিহাস* (টাঙ্গাইল: খন্দকার প্রকাশনী, তা,বি), পৃ: ৮৯; সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২৪ খন্ড (২য়ভাগ), (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৯ খ্রী:), পৃ: ৩৬৭।

[২] জেলাটির প্রশাসনিক সীমানা বার বার পরিবর্তন হয়েছে। এ কারণেই জেলার সীমানা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সম্প্রাসারণ, ও বিভাজন লক্ষ্য করা যায়। এ অঞ্চলের উভয়পাশ দিয়ে প্রবাহমান পদ্মা-যমুনার গতি ধারার ফলেই বিভিন্ন সময়ে এর সীমানার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। জেলাটির সীমারেখার বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটেছিল ১৮৭৭ ও ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে। এ সময়ে উভয়পাশ দিয়ে প্রবাহমান পদ্মা-যমুনার গতিধারার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। মূলত: নদী দু'টির পরিবর্তিত গতিধারাই জেলাটির বর্তমান সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এক কথায় পদ্মা-যমুনার মধ্যবর্তী ত্রিভূজ আকৃতির ভূ-ভাগ হল বর্তমান পাবনা জেলা। দ্র: মৌলভি মুক্তার আহম্মদ সিদ্দিকী, *সিরাজগঞ্জের ইতিহাস* (সিরাজগঞ্জ: লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩২২ বাং), পৃ: ২ ; নুরুল ইসলাম খান, *বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার পাবনা* (ঢাকা: বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রানালয়, ১৯৯০ খ্রী:), পৃ: ১: গড়যধসসধফ অনফঁষ গড়ঃঃধষরন, *এঃযব ঝড়পরড় উপড়হড়সরপ ঐরংঃড়ু ড়ভ চধনহধ উরংঃৎরপঃ ১৮৭২-১৯৩৫*, টহঢ়ঁনষরংযবফ চয. উ. এঃযবংরং, জধলংযধযর টহরাবৎপরঃু, ওহংঃরঃঁঃব ড়ভ ইধহমষধফবংয ঝঁঃফরবং, জধলংযধযর-১৯৮৯, চ. ২২.

[৩] কালার বকরি, কালা গরিয়া, মুক্তাহার, নয়াচুর টেলীপাল, পঞ্জীবাজ, গয়র, ভাদমা, ফটকি, হিজলী প্রভৃতি নামের আউস ধান এ অঞ্চলে প্রচুর উৎপন্ন হয়ে আসছে। দ্র:*পাবনা জেলার ইতিহাস*, ৪র্থ খন্ড, পৃ: ৯; *চলন বিলের ইতিকথা*, পৃ: ৪০৪।

[৪] দিঘে, কালা দিঘে, ভাউলে দিঘে, সোমা দিঘে, মানিক দিঘে, নয়াচুর, কাদনাস, বংশীরাজ, আড়ালিয়া, বরন, সোনাউজিল, ঝুল, ভড়েনাটা, দলকচু, হরিগাছী, রোপা সরসরিষা, কালাকানাই, মাদরা প্রভৃতি আমন ধানের অস্তিত্ব এ অঞ্চলে রয়েছে। দ্র: *পাবনা জেলার ইতিহাস*, ১ম খন্ড, পৃ: ১০।

[৫] আকৃতিতে বেশ একটু বড় এ রকম আউস ও আমন ধানের চালকে এ অঞ্চলে মোটা চাল বলে অভিহিত করা হয়। আর বরণ ধানের চাল বলতে আমন ধানকে এ অঞ্চলে বুঝানো হয়। দ্র: *প্রাগুক্ত*, পৃ: ১০।

[৬] *চলন বিলের ইতিকথা*, পৃ: ৪১।

[৭] ভূড়া ও চিনার চাউল দিয়ে নরম করে এক ধরণের সুস্বাদু খাবার, যা আঁখের গুড় দিয়ে খাওয়া যায় স্থানীয় ভাষায় এই খাবারকে জাউ বলে অভিহিত করা হয়। দ্র: *সঙ্কলন*, পৃ: ৫৩।

আটা ও ছাতু[৮] খাওয়ার প্রচলন ছিল। বৃষ্টির দিনে পদ্মার ইলিশ ও চলনবিলের ভাগার মাছ দিয়ে খিঁচুরী খাওয়ার প্রবনতা ছিল। গমের আটার সাথে হলুদ মরিচ, পেঁয়াজ, লবন মিশিয়ে চাপড়ী তৈরী করা হত।[৯] ধনীদের শখের ও আতিথেয়তার খাদ্য সম্ভারে ছিল কোরমা, পোলাও, বিরানী, জর্দা পোলাও, লুচি, নিমকী, হালুয়া, বিরিয়ানী, পায়েস, সেমাই, ক্ষীর ইত্যাদি। খাদ্য পরিবেশন রীতিতে প্রথমে ভাজী, ভর্তা, ডাল, মাছ, গোস্ত সবশেষে দুধ, দই, মিষ্টান্ন বা টক জাতীয় খাবার পরিবেশন করা হত।[১০] সৌখিন ও নেশা জাতীয় খাদ্য পান, তামাক খাওয়ার প্রবণতা এ অঞ্চলে সর্বকালেই বিদ্যমান।[১১] যুগের আবর্তনে পরিবর্তন হয় মানুষের র‍ুচী ও সভ্যতার, তেমনি পরিবর্তন হয় এ অঞ্চলের মানুষের খাদ্য সামগ্রীর, তবে নানা রকম বিচিত্র সমারোহে বিভিন্ন পিঠা ও খাদ্য সামগ্রী এ অঞ্চলের মানুষের নিকট এখনও বিদ্যমান।

পোষাক অলংকার প্রসাধনী: পাবনা অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর পোষাক বৈচিত্র্যময়। এ অঞ্চলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে অভিজাত ও উচ্চ শ্রেণীর মানুষের পোষাকের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে এ অঞ্চলে বর্ণভেদে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা ধূতী ও হাফসাট, চোগাতি ও চাপকান পরিধান করত। আর সাধারণ মানুষ ধুতি, লুঙ্গি ও গামছা পরিধান করত।[১২] পরবর্তীকালে সাধারণ হিন্দু, মুসলমান সকলেই চাপকান এবং সাদা সুতার ধুতি পরত এবং পুরষেরা এক টুকরা 'বারা' ও নারীরা দুই টুকরা 'বারা' পরিধান করত। জানা যায় এর অনেক পরে লুঙ্গী, জামা (পির‍্যান) পরিধানের প্রচলন শুর‍ু হয়।[১৩] পেশাজীবীগণ অফিস আদালতে কোর্ট, প্যান্ট চোগা, চাপকান, পরিধান করত। মুসলমানদের মধ্যে অনেকে পায়জামা-পাঞ্জাবী, চাপকান, টুপী এবং সম্ভ্রান্ড় হিন্দুগণ ধুতি, প্যান্ট, চোগা, চাপকান ব্যবহার করত।[১৪] অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে জুতা সেন্ডেল পরিধানের প্রচলন থাকলেও নিম্ন পেশাজীবীদের মধ্যে তা ছিলনা। তবে কেউ কেউ কাঠের খড়ম ব্যবহার করত।[১৫] মানুষের অন্যান্য পরিবর্তনের সাথে সাথে পোষাকেরও পরিবর্তন সাধিত হয়। কালক্রমে এ অঞ্চলের মানুষ ডুমা, ধুতী[১৬] ইত্যাদি ছেড়ে শাড়ী, ছায়া, বণ্ঢাউজ, লুঙ্গী পরতে থাকে। মুসলিম পরিবারের মেয়েরা বহিরাবরণ হিসাবে শাড়ীর উপর বোরকা পরতে থাকে। পাদুকা হিসাবে জুতা সেন্ডেলের প্রচলনও হয়।

অলংকার প্রসাধনীতে এ অঞ্চলের মেয়েরা ছিল অগ্রসর। এ অঞ্চলের সর্বস্ড়রের মেয়েরাই কিছু না কিছু অলংকার পরিধান করত। তবে সাধারণ শ্রেণীতে স্বর্ণালংকারের চেয়ে রূপার অলংকারের প্রচলন ছিল অধিক। কেশাভাগ থেকে পাদাগুলি পর্যন্ড় এসব স্বর্ণালংকার রমণীদের অঙ্গের শোভাবর্ধন করত। প্রসাধনী ব্যবহার করে সৌন্দর্য প্রিয়তার প্রবণতা এ অঞ্চলের রমণীদের মধ্যে অতীতকাল থেকেই লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু বিবাহিত মহিলারা সিঁদুর টিপ পড়ত। মুসলমানদের মেয়েরা চোখে কাজল, সুরমা এবং আলতা দিয়ে পা সাজাতো। চুল বাধার জন্য ছিল নানা রঙের ফিতা ও দোসী।[১৭] কেশ পরিচর্যার জন্য নারকেলের তেল, ও হাড়ের চির‍ুনী ব্যবহার করা হত। কেশ ও কাপড় পরিস্কারের জন্য অতীতে মাটি, খইল, কলার খার, ছাই সোডা ব্যবহার হত।[১৮] পুর‍ুষদের মধ্যে সৌখিনেরা সুরমা, আতর ইত্যাদি ব্যবহার করত। কালের আবর্তনে মানুষের র‍ুচি পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তন হয় এ অঞ্চলের মানুষের পোষাক পরিচ্ছদ অলংকার ও প্রসাধনী সামগ্রীর। পরিবর্তন হয় এ অঞ্চলের সমাজ ও সভ্যতার।

বাসগৃহ ও আসবাবপত্র: পাবনা অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর বাস গৃহ ও আসবাবপত্র অতীতে ছিল বৈচিত্রময়। স্থানীয় ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ুর কারণে এ অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ধরনের বাসগৃহ লক্ষ্য করা যায়। এ অঞ্চলের ঘরবাড়ী সাধারণত বাঁশ ঝাড় ও বিভিন্ন ফলমূলের গাছ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকত। তারাশ, উলণ্ঢাপাড়া, রায়গঞ্জ, চাটমোহর, ভাঙ্গুড়ার নিচু জলাভূমিতে বড় বড় নদীর তীরে গড়ে উঠা গ্রামগুলোতে উঁচু ভিটার উপর বাড়ীঘর তৈরী করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অপর দিকে পাবনা সদর ও ঈশ্বরদী এলাকার অপেক্ষাকৃত উঁচু বাড়িঘর বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত। আঙ্গিনার চর্তুদিকে গাছপালাগুলো মহিলাদের পর্দা রক্ষা ছাড়াও ঝড়বৃষ্টি প্রতিরোধের কাজ করে থাকে।[১৯]

গ্রাম্য সাধারণ অধিবাসীর বাসগৃহ বলতে বুঝায় আঙ্গিনার তিন দিকে তিনটি ঘর। ব্যবহার হিসাবে এ ঘরগুলোকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হত। যেমন-বসত ঘর, গোয়ালঘর, গোলাঘর, হেঁসেল বা রান্না ঘর। এছাড়াও স্বচ্ছল অধিবাসীদের জন্য বর্হিবাড়িতে খানকা ঘর বা কাচারী তৈরী করত। এ সমস্ড় ঘরবাড়ী পাটখড়ী, বেত, ছন, নল, বাঁশ ও কাঠ দিয়ে তৈরী হয়ে থাকে। আবার কোন কোন এলাকায় শক্ত মাটির দেয়াল তৈরী করতে দেখা যায়। ঘরগুলোকে ছাপড়া, দোচালা, চারচালা, চৌরি ইত্যাদী নামে অভিহিত করা হয়। উচ্চবিত্ত পরিবারের ঘরগুলোতে টিন দিয়ে ছাউনি দেওয়া হয়। এতে কাঁঠের তৈরী দরজা জানালা ব্যবহৃত হয়।[২০] শহর বা মফঃসল এলাকায় মানুষের পাকা বাড়ীতে টিনের চাল দিয়ে বসবাস করতে দেখা যায়।[২১]

---

[৮] গম এবং যবের সংমিশ্রনে আঠার ন্যায় এক ধরণের সুস্বাদু খাবার আঁখের গুড় দিয়ে খাওয়া যায় স্থানীয় ভাষায় এই খাবারকে ছাতু বলে অভিহিত করা হয়। দ্র: *প্রাগুক্ত*, পৃ: ৫২।

[৯] *সিরাজগঞ্জের ইতিহাস*, পৃ: ১৪।

[১০] আনিসুল ইসলাম, 'তিরিশ চলিণ্ঢশ দশকের পাবনা', মাহতাব উদ্দিন (সম্পা.), *পাবনা দিবস স্মরণিকা* (ঢাকা: পাবনা ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট, প্রথম মুখপত্র, ১৯৯৩ খ্রী:), পৃ: ৩৩।

[১১] সরদার মোহাম্মদ আবদুল হামিদ, *চলনবিলের লোক সাহিত্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮১ খ্রী:), পৃ: ২২২-২২৩।

[১২] *পাবনা জেলার ইতিহাস*, ষষ্ঠ খ‍ন্ড, পৃ: ৮৪।

[১৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ: ৮৪।

[১৪] *প্রাগুক্ত*।

[১৫] খড়ম এক ধরনের পাদুকা যা কাঠ দিয়ে তৈরী করা হয়। আঞ্চলিক ভাষায় একে খড়ম বলা হয়। দ্র: *প্রাগুক্ত*।

[১৬] ডুমা হল গামছার চেয়ে একটু বড়; ছোট শাড়ীর মত যা শরীরে পেঁচিয়ে পরতে হত। আর ধুতী হল সাদা সুতী কাপড়ের তৈরী একরকম পোষাক, যা এ অঞ্চলের মানুষ পরিধান করত। দ্র: *A Statistical Account of Bengal*, P. 299.

[১৭] মো: হাবিবুলণ্ঢাহ, *পাবনা জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা-১৯০০-১৯৪৭*, অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩, পৃ: ২১৭।

[১৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ:২১৭।

[১৯] *বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার পাবনা*, পৃ: ৭৪।

[২০] *পাবনা জেলার ইতিহাস*, পৃ: ৮৪; এম.আবদুল আলীম, "পাবনা অঞ্চলের বাস্ড়বধর্মী ফোকলোর", *ফোকলোর*, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানু-জুন, ২০০২, পৃ: ১০১-১০২।

[২১] *বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার পাবনা*, পৃ: ৭৫; *ঞযব ঝড়পরড়-উপড়হড়সরপ ঐরংঃড়ৎু ড়ভ চধনহধ উরংঃৎরপঃ ১৮৭২-১৯৩৫*, চ. ৫৩.

ঘর বাড়িতে নিত্য ব্যবহৃত আসবাব পত্র বলতে অতীতে চৌকি, পাটি, মাদুর, পিড়ি, টুল, চেয়ার, টেবিল, মোড়া ইত্যাদি ব্যবহার করত। গৃহস্থালির উপকরণাদিতে অতীতে মাটির হাড়ি, পাতিল, কড়াই, ঢাকনা, সরা, শানকি ও কলসী ইত্যদি ব্যবহৃত হত। কাঁশা বা পিতলের থালা বাটির প্রচলন ছিল। এছাড়াও বাশ ও বেঁতের তৈরী ঝুড়ি, কাঠা, কুলা চালুন, সরপোস, পলো, টোপা, ডোল, ব্যবহৃত হত। সুতা ও পাটের তৈরি শিকা, মাটির বেরী, হালা, ধুপীবাতি ব্যবহৃত হত।[২২]

অতিথি আপ্যায়ন: অতিথি আপ্যায়নে পাবনা অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মাঝে অনেক ঐতিহ্য লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ জনসাধারণই নিম্ন পেশাজীবী কৃষক হলেও অতিথি আপ্যায়নে তাদের আন্ড়রিকতার কোন অভাব ছিলনা। কোন অতিথি আগমন করলে প্রথমে বাড়ীর সবাই তাকে মিষ্টি দিয়ে স্বাগত জানাত। পারস্পারিক কুশল বিনিময়ের পর বদনায় পানি নিয়ে হাত মুখ পরিস্কার বা অযু করার জন্য তাকে আহ্বান জানানো হত। সকল বাড়ীতেই অতিথি আপ্যায়নের জন্য খানকা ঘর বা বৈঠক খানা না থাকলেও মেহমানকে ছনের ঘরের মেঝে, বারান্দা, বহির বাড়ী অথবা বাড়ীর পাশের গাছতলায় খেঁজুর পাতার বিছানা, টুল, বা পিড়িতে বসতে দেওয়া হত। স্বাভাবিক আপ্যায়নে টুল বা পিড়িতে বসায়ে নাড়ু, মুয়া, চিড়া, খই ইত্যাদি খাবার দেওয়ার প্রচলন ছিল। এ পর্ব শেষে একটা পান দিয়ে অত্যন্ড় পরিতৃপ্ত করার ব্যবস্থা ছিল। এ ছাড়াও শিক্ষিত সমাজে মিষ্টান্ন, চা-বিস্কুট, ফলমূল, পান- তামাক দিয়ে আপ্যায়নের রীতি এ অঞ্চলে আবহমানকাল থেকেই চলে আসছে। গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের মধ্যে আতিথেয়তায় সংমিশ্রনে পান-তামাকের ব্যবহার লক্ষণীয়।[২৩]

ধর্মীয় ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠান: ধর্মীয় ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠান[২৪] বলতে আনন্দানুষ্ঠানকে বুঝায় অর্থাৎ অনুষ্ঠান বলতে সে সব সামাজিক জমায়েতকে বুঝায় যা থেকে আনন্দ লাভ করা যায়। তবে সামাজিক পরিবেশে সে আনন্দের স্বরূপ সব সময় একরকম হয় না। সে জন্য পারিবারিক আঙ্গিনায় সীমিত এবং সবাইকে নিয়ে কৃত অনুষ্ঠানকেই উৎসব বলা হয়ে থাকে।[২৫] নিম্নে পাবনা অঞ্চলের জনসাধারণের ঈদ উৎসব, আশুরা, শবে বরাত, হালখাতা, নৌকা বাইচ, মেলা ও ঋতুভেদে বিভিন্ন উৎসবের বর্ণনা পেশ করা হলো:

ঈদ উৎসব: এ অঞ্চলের মানুষের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হলো ঈদ। রমজান মাসের এক মাস সিয়াম সাধনা শেষে ঈদুল ফিতর ও জ্বিলহজ্ব মাসের দশ তারিখে ঈদুল আযহা উদযাপিত হয়। রমজানের ঈদের সকালে ফজরের নামাজ শেষে স্বজনদের কবরস্থান জিয়ারত শেষে গোসল করে ঈদের প্রধান আকর্ষণ সবাইকে ঈদগাহ মাঠে সমবেত হতে দেখা যায়। ঈদের দিনে নানা রকম মিষ্টি সামগ্রী বিশেষ করে পায়েশ রান্না করা হয়। ঈদগাহ মাঠে নামাজের পূর্বেই মিষ্টি মুড়ি বা মোয়া সবার মাঝে বিতরণ করা হয়। নামাজ শেষে পাড়ায় পড়ায় একটি নির্ধারিত বাড়ীতে চাল-ডাল মিশ্রিত খিঁচুরী সবাই মিলে সমবেতভাবে খেতে দেখা যায়, স্থানীয় ভাষায় যাকে "সিন্নি" খাওয়া বলা হয়। কুরবানীর ঈদে কুরবাণীর পশু জবাই করে সমাজের সবার মাঝে বিতরণ করতে দেখা যায়। বহু বছর ধরে এ অঞ্চলের প্রধান ঈদের জামায়াত অনুষ্ঠিত হয় আরিফপুর গোরস্থান সংলগ্ন ঈদগাহ মাঠে। এছাড়া সিরাজগঞ্জ হাজী আহমেদ আলী আলিয়া মাদরাসা, শাহজাদপুর দরগাহপাড়া ঈদগাহ মাঠ ও সাঁথিয়া হলুদঘর ঈদগাহ মাঠে ঈদের বড় জামায়াত অনুষ্ঠিত হয়।[২৬]

আশুরা: প্রতি বছর ১০ই মুহররম তারিখে হজরত আলী (রা:) এর পুত্র ইমাম হোসাইন (রা:) এর কারবালার শাহাদাতের ঘটনা স্মরণ করে এ অঞ্চলের মানুষ আশুরাকে শোক উৎসব হিসাবে পালন করে। আশুরার চার পাঁচ দিন পুর্ব হতেই ছোট ছেলেরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে মর্সিয়া গেয়ে চাল-ডাল সংগ্রহ করে। শহর এলাকায় তীর, ধনুক, বর্ষা, লাঠি ইত্যদি হাতে নিয়ে 'তাজিয়া' মিছিল বের হতে দেখা যায়। এ দিনে মিলাদ মাহফিল ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।[২৭]

শবেবরাত: এ অঞ্চলের মুসলিম সমাজের একটি বড় উৎসব হল শবেবরাত। শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতে 'শবেবরাত' পালন করা হয়। এ দিনে সকাল থেকেই বাড়ী বাড়ী র"টি ও হালুয়া তৈরী করে বিতরন করতে দেখা যায়। রাতে সবাই এবাদত বন্দেগী করে এবং ঈশ্বরদী সহ বিভিন্ন এলাকায় স্বজনদের কবর জিয়ারত করতে রাতে কবরস্থান সমূহে গমন করতে দেখা যায়।

হালখাতা: বাংলা নববর্ষ অর্থাৎ ১ বৈশাখ পাবনা অঞ্চলে অতি সমারোহে 'হালখাতা' উৎসব পালন করা হয়। বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক হিসাবপত্র মিলানো ও হাল-নাগাদ করার জন্য এ উৎসব পালন করা হয়। অতীতে মৌসুমী ফল যেমন তরমুজ, বাঙ্গী, কেশর ইত্যাদি দিয়ে হালখাতা উৎসবে আপ্যায়ন করা হত। বর্তমানকালে মিষ্টি, নিমকী ও নানা রকম জিনিস দিয়ে আপ্যায়ন করতে দেখা যায়।[২৮]

নৌকা বাইচ উৎসব: বর্ষাকালে শ্রাবণের অবিশ্রান্ড় বারিপাতে বাংলার নদ-নদী খাল-বিল ভরে উঠত। এ সময়ে পাবনা অঞ্চলে নৌকা বাইচ চলত। এ অঞ্চলের পদ্মা, যমুনা, বড়াল, আত্রাই, হুরাসাগর, করতোয়া, গোহালা, গুমানী, ফুলজোর, ভাদাই, ইছামতী ইত্যাদি নদী ছাড়াও চলন বিলের বিশাল অঞ্চল জুড়ে বর্ষাকালে ঘটা করে নৌকা বাইচ উৎসব অনুষ্ঠিত হত। আয়োজকরা হাটের দিনে ঢোল পিটিয়ে সবাইকে নৌকা বাইচের কথা জানিয়ে দিত। সে অনুসারে গ্রাম গ্রামান্ড়র থেকে বিভিন্ন আসরের নৌকা বাইচালরা ছুটে আসত। উৎসবস্থলে[২৯] নৌকা বাইচের নৌকার গাঠনিক বিভাজনের সুত্রে শ্রমিকদের শ্রম বিভাজিত হত। কর্মীরা নৌকার বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করে নৌকা পরিচালনার কৌশল প্রয়োগ করে থাকে। এ অঞ্চলে নৌকার কর্মীদেরকে বলা হয় বাইচাল। বাইচের নৌকায় মূলভূমিকায় থাকে একজন পরিচালক। তার হাতে বৈঠা থাকেনা, কিন্তু নৌকার সর্বত্রই তিনি বিচরণ করেন। একই সাথে তিনি গায়কও বটে। সে অর্থে তাকে সাইর বলা হয়। সাইর ঢোল বাজিয়ে গান গাইতে থাকে। বাদকের তালে তালে বাইচালরা বৈঠা মারে। বর্তমানকালে সব নদীতে বাঁধ দেওয়ার ফলে তেমন আর নৌকা বাইচ হয়না। তবে চলনবিল এলাকার এখনও নৌকা বাইচের প্রচলন আছে।[৩০]

মেলা: মেলা পাবনা অঞ্চলের জনসাধারণের পণ্য কেনা-বেচা ও আনন্দ উৎসবের অন্যতম কেন্দ্র। এ অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মেলা উৎসব বসে। শাহজাদপুর, চৌহলী,

---

[২২] *প্রাগুক্ত*।

[২৩] *সিরাজগঞ্জের ইতিহাস*, পৃ: ১৪।

[২৪] খোন্দকার রিয়াজুল হক, *বাংলাদেশের উৎসব* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫ খ্রী:), পৃ: ৯।

[২৫] আহমেদ শরীফ (সম্পা.), *বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯ খ্রী:), পৃ: ৭০।

[২৬] *পাবনা জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (১৯০০-১৯৪৭)*, পৃ: ২৭৬।

[২৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ: ২৭৬।

[২৮] আব্দুলণ্ঢাহ ফার"ক, *জীবন স্মৃতি* (ঢাকা: মিসেস সুফিয়া ফার"ক, ১৯৯৮ খ্রী:), পৃ: ৭।

[২৯] *চলন বিলের ইতিকথা*, পৃ: ৪৪০।

[৩০] *বাংলাদেশের লোকসাহিত্য নিম্নবিত্ত সমাজ*, পৃ: ২৪-২৫।

ধুলাউরি, দুলাইসহ বিভিন্ন জায়গায় এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানকালে সরকারী ব্যবস্থাপনায় কৃষি ও বৃক্ষ মেলার আয়োজন অঞ্চলের সব উপজেলাতেই লক্ষ্য করা যায়।[৩১]

ওরশ ও জালসা: এ অঞ্চলের মানুষের বার্ষিক ধর্মীয় উৎসব হল ওরশ ও জালসা। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মাদরাসা, মসজিদ ও মাজারকে কেন্দ্র করে এ সকল উৎসব পালিত হয়। এলাকায় এয়ানেতপুর, শাহজাদপুর ও হাদলে সব চেয়ে বড় ওরশ উৎসব পালিত হয়। ওরশ উপলক্ষে বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজন দাওয়াতও করা হয়। জালসা মাহফিলে ধর্মীয় বিষয় আলোচনা করা হয়। আর এ সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দোকানপাট বসে, যেখানে নানারকম জিনিসপত্র উৎসবমূখর পরিবেশে বেচাকেনা করা হয়।

নবান্ন উৎসব: পৌষ ও মাঘ মাসে নতুন ধান কাটা উপলক্ষে পাবনা অঞ্চলে নবান্ন উৎসব পালন করা হয়। নানারকম পিঠা তৈরী করা হয় এ উৎসবে। বিশেষ করে খেঁজুরের পাটালী ও দুধ দিয়ে তৈরী করা হয় শীতের পিঠা। চারদিকে মৌ মৌ গন্ধে মুখরিত হয়ে উঠে নবান্ন উৎসব।[৩২]

অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানাদী: **এ অঞ্চলের মানুষের সামাজিক অন্যান্য অনুষ্ঠানাদির মধ্যে জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদীর আয়োজন করা হয়। মুসলিম সমাজে জন্ম উপলক্ষে আকীকা, নামকরণ এবং খাতনা উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, বিবাহ উপলক্ষে ওয়ালিমা ও মৃত্যুর পর জিয়ারত উপলক্ষে নানা উৎসবের আয়োজন করা হয়।**[৩৩]

জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক জীবনধারা

পাবনা অঞ্চলটি সাহিত্য-সংস্কৃতি ললিত কলা ও শিক্ষাক্ষেত্রে সুপ্রাচীনকাল থেকে বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করেছে। লোকশিল্প, ধাঁধা, প্রবাদ, ছড়া, লোকগীতি, আখ্যান বর্ণনায় এ অঞ্চলের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে। নিম্নে এ অঞ্চলের মানুষের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি যেমন সংগীত, গীত, নাটক, ছড়া, ধাঁধাঁ, প্রবাদ-প্রবচন, লোক-শিল্প, খেলাধুলা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনার প্রয়াস পাব।

লোক সংগীত: লোকসাহিত্যের অন্যতম প্রধান শাখা হলো লোকসংগীত। লোকমানস থেকে সম্ভূত এ সংগীত সাধারণত শ্রুতি ও স্মৃতি নির্ভর করেই বহমান থাকে। আধুনিক গানের মতই লোক সংগীতেও সুর বাণীর সমাবেশ ঘটে থাকে। যেহেতু লোক সংগীত গ্রামীণ নিরক্ষর ও অর্ধ শিক্ষিত লোকসমাজের সৃষ্টি, সে কারণে এ সঙ্গীতের ভাষা ও সূর সম্পূর্ণরূপেই আঞ্চলিক।[৩৪] পাবনা লোকসঙ্গীতে সমৃদ্ধ একটি অঞ্চল। এখানে ধুয়া, বারাশে, জারি, সারি, তত্ত্বমূলক ইত্যাদি লোকসঙ্গীত প্রচলিত রয়েছে। এ অঞ্চলের লোকসঙ্গীত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মুগ্ধ করেছিল। কলিকাতা থেকে নৌপথে শাহজাদপুর যাতায়াতকালে কবি একদিন শুনতে পেলেন,

'যুবতী ক্যান বা কর মনভারী
পাবনা থ্যাহা আন্নাদেব ট্যাহা দামের শাড়ী।'[৩৫]

পাবনা অঞ্চলের যে সমস্ড় লোককবির নাম পাওয়া যায় তাদের মধ্যে পাগলা কানাই এর নাম সবিশেষ স্মরণযোগ্য। কবি পাগলা কানাই এর জন্ম যদিও যশোর জেলায় তবুও তিনি তার জীবনে অধিকাংশ সময় পাবনায় কাটিয়েছেন। এছাড়া মখদুম বয়াতী, আলিমুদ্দিন বয়াতী, জায়েদ ফকির প্রমুখের নাম উলেণ্ঢখযোগ্য।[৩৬] নিম্নে পাবনা অঞ্চলে প্রচলিত কয়েক প্রকার লোকসংগীতের পরিচয় তুলে ধরা হলো:

ধুয়া গান: পাবনা অঞ্চলে প্রচলিত লোকসংগীতের প্রধান হলো ধুয়া গান। সমকালীন বিভিন্ন ঘটনা, যুগ জিজ্ঞাসা ও বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্বের বিচিত্র সমাবেশ দেখা যায় এ গান গুলোতে। জমি নিরানো, ধানকাটা, বা বর্ষার দিনে বৃষ্টিতে ভিজে খেত খামারের কাজের সময় এ গান গাওয়া হয়।[৩৭] আবহমানকাল থেকেই ধুয়া গানের মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত হয়ে আসছে।

সারিগান: সারি বা শ্রেণীবদ্ধভাবে বহুলোক একই কাজ করার সময় সেই কর্ম প্রেরণায় ও কর্মের ছন্দ থেকে উৎসারিত গানকে সারিগান বলে। এ অঞ্চলের মাঠে ঘাটে নৌকা বাইচের সারি, ক্ষেত নিড়ানোর সারি, পালকী বাওয়ায় সারি বিশেষভাবে উলেণ্ঢখযোগ্য। তবে এ অঞ্চলে সারি গান বলতে নৌকা বাইচের গানকেই বেশী বুঝানো হয়।[৩৮] সারিগান বিশেষত্ব তাওহীদ রেসালাত ও আখেরাতকে প্রাধান্য দিয়ে গাওয়া হয়। যেমন-

জোরে জোরে লাগাও টান হেইয়ো বলরে
হেইয়ো জোয়ান হেঁইয়ো-আলণ্ঢাহ বল হেঁইয়ো
জোরসে টান হেইয়োঁ।[৩৯]

বারাশে গান: বার মাসি গানকে বারাশী গান বলা হয়। মাসের পরিবর্তনের পটভূমিকায় মানুষের সুখ-দুঃখ নিয়ে নর-নারীর বিরহ-মিলনজনিত চিন্ড়নুভূতিই এ গানের মর্মকথা। এ গানের মাধ্যমে এ অঞ্চলের মানুষের তাকদীরের প্রতি ইসলামী আকীদায় যে বিশ্বাস রয়েছে তা ফুটে উঠে।[৪০]

তত্ত্বমূলক গান: আধ্যাত্মিকতা, ধর্মের নানা রহস্য, তথ্য ও তত্ত্ব, মানবদেহের গঠন, সৃষ্টির রহস্য নানা বিষয় নিয়ে রচিত হয় তত্ত্বমূলক গান। এ অঞ্চলের বাউল, লোককবিদের কণ্ঠে এ গান শোনা যায় যেমন-

আ-আ-শোন খবর আছে নয় মিছে
তিরিশ হরফের যোগে বান্দা কোরানো পৃষ্ঠে
ওরে 'আলিফ' হইতে নাক হইল
'বে' তে চক্ষু বানাইল ওরে তে' দিয়াসে তালু দিছে

---

[৩১] *পাবনা জেলার ইতিহাস*, ৪র্থ খন্ড, পৃ: ৮৭।

[৩২] ওয়াকিল আহমেদ, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪ খ্রী:), পৃ: ৮৭।

[৩৩] *চলন বিলের ইতিকথা*, পৃ: ৪১৮।

[৩৪] শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য*, ১ম খন্ড (কলিকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৭৩খ্রী:), পৃ: ২৫৬।

[৩৫] ড. মুহাম্মদ আব্দুল খালেক, 'পাবনা অঞ্চলের লোক সংস্কৃতি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ', শিবজিত নাগ (সম্পা.), *শতবর্ষ স্মরণিকা ১৯৯০* (পাবনা: শিবজিত নাগ ১৯৯১ খ্রী:), পৃ: ৫৭।

[৩৬] মোঃ আব্দুল আলীম, "পাবনা অঞ্চলের লোক সংস্কৃতি" *অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ*, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১ খ্রী:, পৃ: ৪৫।

[৩৭] *চলন বিলের লোকসাহিত্য* পৃ: ২০; *পাবনা অঞ্চলের লোক সংস্কৃতি*, পৃ: ৪৬।

[৩৮] খগেশ কিরন তালুকদার, শাহিদা খাতুন (সম্পা.), *লোকউৎসবে ঐতিহ্য চেতনা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮ খ্রী:), পৃ: ৬৬-৭৩; মোঃ মাহবুব আলম বেগ, *বাংলাদেশের লোকসাহিত্য নিম্নবিত্ত সমাজ*, অপ্রকাশিত পি-এইচ.ডি থিসিস, বাংলা বিভাগ: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩, পৃ: ১৬৯।

[৩৯] *পাবনা জেলার ইতিহাস*, ৪র্থ খন্ড, পৃ: ১২৭।

[৪০] মুহাম্মদ আবদুল খালেক, *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক-উপাদান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫ খ্রী:), পৃ: ২১৪; মফিজুল ইসলাম (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ: ৩০-৩১।

'ছ' হরফে যুক্তি আছে .....[৪১]

মেয়েলী গীত: পাবনা অঞ্চলে লোকসংগীতের ধারায় মেয়েলী গীত এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। নারী জীবনের আনন্দ-বেদনা, কামনা-বাসনা, উলণ্ডাস নিয়ে এ গীত রচিত।[৪২] বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সুরে এ গীত পরিবেশন করা হয়। বিয়ে, খাতনা, আকিকা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সমবেত মহিলারা এ গীত পরিবেশন করে। ঘটকালী, ঢেঁকিবরণ, হলদীকোটা, খীর খাওয়ানো, বিবাহোত্তর মায়ের কর্তব্য, বরবরণ, কনে সম্প্রদান, নববধুর দর্শন ইত্যাদি উপলক্ষে মেয়েলীগীত পরিবেশন করা হয়।[৪৩]

নাটক: পাবনা অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মাঝে নাট্য চর্চা শুর" হয়েছিল কবে তার সঠিক তথ্য পাওয়া না গেলেও ঊনিশ শতকের শেষ দিক থেকে এখানে বিভিন্ন বিষয়ে নাটকের মঞ্চায়ন ঘটতে থাকে এবং এ নাট্য চর্চা ও নাট্য সংস্কৃতিতে বিশেষ অবদান সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সাবিত্রী নাটক অভিনয় হয় মালঞ্চীতে। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বনমালী ইনষ্টিটিউট'।[৪৪] নাটক মানব জীবনে প্রতিচ্ছবি হিসাবে এ অঞ্চলে যথেষ্ট অবদান রাখে। ইসলামের ঐতিহাসিক দিক যেমন কারবালার ঘটনা, কালুগাজী ইত্যাদি বিষয় নাটকের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে পরিবেশিত হয়। এ অঞ্চলের মানুষেরা নাটককে উৎসবের আনন্দ ও অবসব বিনোদনের একটি মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে আসছে।

ছড়া: লোকসাহিত্যের অন্যতম প্রধান জনপ্রিয় একটি সমৃদ্ধ শাখা হলো ছড়া। পাবনা অঞ্চল ছড়া সমৃদ্ধ অঞ্চল। এখনকার প্রচলিত ছড়াগুলো উপযুক্ত আলোচনায় সন্নিবেশিত বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যমান এবং বিষয়বস্তু অত্যন্ড় বৈচিত্র্যপূর্ণ।[৪৫] বিষয় বৈচিত্র্যেতার ভিত্তিতে পাবনার ছড়াগুলোকে প্রধানত চারভাগে ভাগ করা যায়। (ক) শিশু বিষয়ক ছড়া (খ) খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদ মূলক ছড়া, (গ) মেয়েলী ছড়া ও (ঘ) বিবিধ ছড়া।

শিশুবিষয়ক ছড়াগুলোকে আবার চারভাগে ভাগ করা যায় (ক) ঘুমপাড়াননি ছড়া, খ) বসা শেখার ছড়া (গ) হাঁটা শেখানোর ছড়া (ঘ) দুধ খাওয়ার ছড়া (ঙ) আনন্দ দান বা রসিকতার ছড়া।[৪৬]

মন্ত্র: মন্ত্র হলো ছন্দোবদ্ধ চরনাশ্রিত কতকগুলি শব্দ সমষ্টি। এতে মন্ত্রচারীর বিশেষ ইচ্ছা বা আকাংখা ব্যক্ত হয়ে থাকে।[৪৭] পাবনা অঞ্চলে ব্যক্তি, গার্হস্থ্য ও সমাজ

[৪১] *পাবনা অঞ্চলের লোক সংস্কৃতি*, পৃ: ৬৫।

[৪২] মুহাম্মদ আব্দুল জলিল(সম্পা.), *বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলের মেয়েলী গীত* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪ খ্রী:), পৃ: ৩-৪; মোহাম্মদ সিরাজুল কাসিমপুরী, *বাংলাদেশের লোকসংগীত পরিচিতি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩), পৃ: ২৮৯।

[৪৩] *বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলের মেয়েলী গীত*, পৃ: ৪; *বাংলাদেশের লোকসাহিত্য নিম্নবিত্ত সমাজ*,, পৃ: ১৭৬; মাজহার"ল ইসলাম তর", *চাঁপাইনবাবগঞ্জের লোক সংস্কৃতি পরিচিতি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯ খ্রী:), পৃ: ৭৯।

[৪৪] অসিতকুমার মুকুটমনি, সম্পা. স্মরণিকা নাট্যোৎসব-৯৬ পাবনা (পাবনা: বনমালী ইনষ্টিটিউট, ১৯৯৬ খ্রী:), পৃ: উলেণ্ডখ নাই।

[৪৫] ড. মোমেন চৌধুরী, 'হীরা মনি', বেতার বাংলা (বর্ষ ২৭: সংখ্যা ৭, ১৪০৫ বাং), পৃ: ১৪; *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, পৃ: ৫৮৬; *বাংলার লোকসাহিত্য*, ১ম খ", পৃ: ১০০

[৪৬] *পাবনা জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা-১৯০০-১৯৪৭*, পৃ: ৩৭০।

[৪৭] *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, পৃ: ৫৯৪।

জীবনের নানাক্ষেত্রে যাদুমন্ত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন, মন্ত্র পড়ে বড়শি ফেললে মাছ পাওয়া যায়: এ বিশ্বাস প্রচলিত আছে এ অঞ্চলে। গ্রামীন মানুষেরা তাই মন্ত্র পড়ে। যেমন বর্ণিত হয়েছে,

খুবরী আইশট্যা-র"ই তোলব বাইশটা

সগলের বশ্যি হলাকলা-আমার বশ্যি সবরী কলা।[৪৮]

এমনিভাবে মৌচাক ভাঙ্গা মন্ত্র, সাপের বিষ নামানো মন্ত্র, হাত চালান করা মন্ত্র, বান কাটা মন্ত্র ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়।[৪৯]

ধাঁধাঁ: ধাঁধাঁ এক প্রকার রহস্যপূর্ণ রচনা। ধন্দ শব্দ থেকে এর উৎপত্তি। অর্থ সংশয়, দুরহ, সমস্যা ইত্যাদি। সাধারণত গদ্যাত্মক একটি বাক্যে অথবা ছন্দোবদ্ধ ও অন্ড়্য-মিল যুক্ত দুই থেকে চার চরণে ধাঁধাঁ সমাপ্ত হয়।[৫০] পাবনা অঞ্চলে ধাঁধাঁ শব্দটি 'মান' নামে পরিচিত।[৫১] আবার ঈশ্বরদী এলাকায় ধাঁধাঁকে 'পুন' বলেও অভিহিত করতে দেখা যায়।[৫২] সারাদিনের কর্মক্লান্ত শরীরে এলিয়ে সন্ধ্যায় ছেলে-মেয়ে বা নাতি নিয়ে মাদুর পেতে বসে ধাঁধাঁর আসর বসতে দেখা যায়। মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, প্রাণী, উদ্ভিদ, নিসর্গ প্রকৃতি, খাদ্য, সংখ্যা, পারিবারিক আত্মীয়মূলক বিভিন্ন ধাঁধাঁ এ অঞ্চলে প্রচলিত। মানুষের অঙ্গ নিয়ে এ অঞ্চলের ধাঁধাঁ যেমন,

একটু খানী পুস্কনীতে জল টলমল করে
রাজার বেটার সাধ্য নাই জাল ফেলতে পারে
উত্তর : চোখ[৫৩]

প্রবাদ: লোকসাহিত্যের দিক থেকে পাবনা অঞ্চল প্রবাদে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। এ অঞ্চলে প্রবাদকে আঞ্চলিক ভাষায় 'শেণ্ঢাক' বলা হয়। গ্রামের মানুষের দুঃখ-সুখ, হাসি-কান্না, আশা-নিরাশা, পরিহাস ইত্যাদি বিষয় প্রবাদগুলোতে প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন, মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে এ অঞ্চলে প্রবাদ মাছের মধ্যে কই মাছ ভাল, নারীর মধ্যে শ্যামলা কালো।[৫৪]

লোকশিল্প: আবহমানকাল থেকেই পাবনা অঞ্চল লোকশিল্পে সমৃদ্ধ। বিভিন্ন পেশাজীবি মানুষ তাদের পেশা দিয়েই সমৃদ্ধ করেছে লোকশিল্পকে। যেমন-কামার, কুমার, জেলে, তাঁতীদের তৈরি সামগ্রী। মানুষের গৃহস্থলি সামগ্রী এ অঞ্চলের বাস্ড়বধর্মী শিল্প। নক্শীকাঁথা, নক্শীপাখা, শিকা প্রভৃতিতে পাবনা অঞ্চলের নিরক্ষর মানুষেরও শিল্প প্রতিভা ফুঁটে উঠেছে।[৫৫]

[৪৮] *পাবনা জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা-১৯০০-১৯৪৭*, পৃ: ৪১২।

[৪৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ: ৪১২-৪১৫।

[৫০] *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, পৃ: ৫৯৮-৫৯৯; ড. শীমা বসাক, *বাংলা ধাঁধাঁর বিষয় বৈচিত্র ও সামাজিক পরিচয়* (কলিকাতা: পুস্ড়ক বিপনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৮ খ্রী:), পৃ: ১-৩।

[৫১] *বাংলা ধাঁধাঁর বিষয় বৈচিত্র ও সামাজিক পরিচয়*, পৃ: ৩; *বাংলার লোকসাহিত্য:ধাঁধাঁ*, পৃ: ১৫।

[৫২] *পাবনা জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা-১৯০০-১৯৪৭*, পৃ: ৪১৭।

[৫৩] *চলনবিলের লোক সাহিত্য*, পৃ: ১৮৯।

[৫৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ: ১৪৯।

[৫৫] *পাবনা অঞ্চলের বাস্ড়বধর্মী ফোকলোর*, পৃ: ৯৮-১০৫; *সিরাজগঞ্জের লোকসংস্কৃতি চর্চা*, পৃ: ১৮।

লোক খেলাধুলা: বাংলাদেশের একটি প্রাচীন জনপদ পাবনা অঞ্চল। এ অঞ্চলটি খেলাধুলায় সমৃদ্ধ। খেলার উপকরণ এবং স্থান বিবেচনায় লোক খেলাধুলাকে ১০ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন[৫৬]

১. অস্ত্র, লাঠি, শক্তির খেলা: লাঠি ঘুরানো, কুস্ড়ী, বাজীখেলা, রশি টানাটানি, যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা ইত্যাদি।

২. গুটি ও খুঁটির খেলার: দাবা, কেরাম, বাঘ-বকরী, কাঁচের গুটি খেলা, পাশা খেলা, জোড়-বিজোড়, পাঁচগুটির খেলা, ছয়কড়ীর খেলা, ষোল গুটির খেলা ও কড়ি খেলা ইত্যাদি।

৩. পানির খেলা: সাঁতার, নৌকাবাইচ, খেলা মকুচি, মাছ ধরা খেলা, ঘাগর জানি খেলা ইত্যাদি।

৪. কোটবন্ধী বা ছকের খেলা: হাডুডু-কাবাডী, বদন খেলা গোলণ্ডাছুট, বৌ-ছি, এককা-দোককা, ছাগল খেলা ইত্যাদি।

৫. চোখ বান্দা খেলা: কাঁনামাচি, দাঁড়িবাধা, লুকোচুরি, চোর-ডাকাত খেলা, চোর-পুলিশ খেলা ইত্যাদি।

৬. ঘরকন্যা খেলা: রান্না-বান্না, ঘর-সংসার, পুতুল খেলা, বৌ-শাশুড়ী খেলা, জাল-নদী খেলা ইত্যদি।

৭. পশু-পাখীর খেলা: বানর খেলা, সাপ খেলা, কুমির-কুমির খেলা, টিয়াপাখি ও ময়না পাখির খেলা ইত্যাদি।

৮. ছড়ার খেলা: উপ্যান্টি বাইস্কোপ, ঝোলই সই খেলা, হাঁটি হাঁটি পাপা খেলা, তালকাটি খেলা, ব্যাঙের মাথা খেলা ইত্যাদি।

৯. ধাঁধাঁর খেলা: তাসের ধাঁধাঁ খেলা, সাইকেল ধাঁধাঁ, চাকার ধাঁধাঁ, মাকরীর ধাঁধাঁ ইত্যাদি।

১০. গুড্ডি বা ঘুড়ি উড়ানো: সাপা ঘুড়ি, চিলা ঘুড়ি, ঢাউস ঘুড়ি, বামন ঘুড়ি, পটকা ইত্যাদি নানা রং ও নামের ঘুড়ি উড়ানো খেলা ইত্যাদি।

প্রাচীন নিদর্শনাবলী ও মুসলিম পুরাকীর্তি

শাহজাদপুর শাহী মসজিদ ও মাজার: পাবনা অঞ্চলের সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরের করতোয়া নদীর তীরবর্তী মসজিদটি এ অঞ্চলের সবচেয়ে প্রাচীন মসজিদ বলে ধারণা করা হয়। হযরত মখদুম শাহদৌলা শহীদ (র:) এ অঞ্চলে আগমন করে শাহজাদপুরে তিনি প্রথম এ মসজিদ নির্মাণ করেন, স্থানীয় হিন্দু রাজার সাথে যুদ্ধে তিনি ও তাঁর ২১ জন সহচর শাহাদাত বরণ করেন। এ মসজিদের ভিতরের কার্কার্য খুবই মনোরম। মসজিদের পার্শ্বেই হযরত মখদুম শাহদৌলার (র:) বিশাল গম্বুজ আকৃতির মাজার এবং তার পার্শ্বে তাঁর সহযোগীদের মাজার রয়েছে। পাবনার মুসলিম স্থাপত্য নিদর্শনের মধ্যে এটি উলেণ্ডখযোগ্য নিদর্শন।[৫৭]

মাসুম খাঁর মসজিদ: পাবনার যে সব মুসলিম স্থাপত্য নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলি প্রকৃতই বাংলার মুসলমানদের ইতিহাসের আকর উৎস হিসাবে বিবেচিত হয়। জেলা কীর্তিরাজির এক অর্পূব নিদর্শন চাটমোহর পুরান বাজারের 'মাসুম খাঁর মসজিদ'। মাসুম খাঁ কাবুলী ছিলেন সম্রাট আকবরের পাঁচ হাজারী মনসবদার। তিনি সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন এবং পাবনা অঞ্চলে কিছু সময়ের জন্য একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। মসজিদের প্রাপ্ত শিলালিপি পাঠে জানা যায়, তাঁরই সময়ে মোহাম্মদ খাঁন কাকশালের পুত্র

[৫৬] *পাবনা জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা-১৯০০-১৯৪৭*, পৃ: ৪২৯।

[৫৭] সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *বাংলাদেশের পুরাকীর্তি* (ঢাকা: মওলা ব্রাদার্স, ২০০১ খ্রী:), পৃ: ২৪০; খান বাহাদুর আব্দুল হাকিম (সম্পা:), *বাংলা বিশ্বকোষ*, ৩য় খন্ড (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্ড়ান, ১৯৭৩ খ্রী:), পৃ: ৬১৪।

খান মোহাম্মদ এ ইমারতটি ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে (৯৮৯ হি:) নির্মাণ করেছিলেন।[৫৮] মতাল্ড়রে আইন-ই- আকবরী গ্রন্থসূত্রে জানা যায়, এ মসজিদটি মুঘল রাজত্বকালে ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে মাসুম খাঁ নামক জনৈক কাবুলী সেনাধ্যক্ষ কর্তৃক নির্মিত হয়।[৫৯] মাসুম খাঁর মসজিদটি 'চাটমোহর শাহী মসজিদ' নামেও সমধিক পরিচিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইট দ্বারা নির্মিত আয়তকার মসজিদটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট। এর দৈঘ্য ৫৯ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ২৭ ফুট দেওয়ালের প্রশস্ড়তা ৬ ফুট এবং উচ্চতা ছিল ৪৫ ফুট। মসজিদটির সম্মুখভাগ তিনটি আয়তকার ফ্রেমের মধ্যে তিনটি খিলান বিশিষ্ট প্রবেশ পথে বিভক্ত। এ তিনটি প্রবেশ পথের খিলান পথটি দুই পার্শ্বের খিলান পথ থেকে অপেক্ষাকৃত উঁচু। তিনটি প্রবেশ পথের সাথে সঙ্গতি রেখে পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব রয়েছে। চারকোনে রয়েছে অষ্টকোণাকৃতির গম্বুজ। মসজিদটি সংস্কারের অভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া সত্বেও এর কেন্দ্রীয় মিহরাবের শীর্ষে ইট অলংকরণের চিহ্ন আজও দৃশ্যমান। মসজিদটির ভিতরে একখন্ড কালো পাথরের একপৃষ্ঠে ফারসী ভাষায় মসজিদ নির্মাণের ইতিহাস অংকিত রয়েছে। বর্তমানে পাথর খন্ডটি রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে।[৬০]

সমাজগ্রামের মসজিদ: চাটমোহর উপজেলার সমাজ গ্রামে একটি প্রাচীন ভগ্ন সমজিদের অস্ড়িত্ব বিদ্যমান। এক গম্বুজ বিশিষ্ট ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ইট দ্বারা নানা রকম কার্কার্য খচিত এ মসজিদটির উচ্চতা প্রায় ২৩ ফুট, প্রস্থ ১৮ ফুট। একটি বিরাট দীঘির সন্নিকটে উচ্চ ভূমির উপর মসজিদটি নির্মিত। মসজিদের সম্মুখে দু'টি কালোবর্ণের স্ড়ম্ভ রয়েছে। মসজিদের ভিতরে কুরআনের আয়াত লিখিত আরও দুটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। লিপি দুটি ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে দিলণ্ডীর পাঠান সম্রাট শেরশাহ এর পুত্র শাহাজাদা সেলিম কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। মসজিদটিকে ঘিরে এলাকায় নানা কাহিনী ও কিংবদল্ড়ী ছড়িয়ে আছে। বর্তমানে এ মসজিদটি প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে কালের অতল গহ্বরে বিলিন হতে চলেছে।[৬১]

পাইকপাড়া মসজিদ ও পীরের দরগা: চাটমোহর উপজেলার হান্ডিয়াল বাজারের পশ্চিম দিকে পাইকপাড়া গ্রামে পাঠান আমলের একটি প্রাচীন মসজিদ বিদ্যমান। এক গম্বুজ বিশিষ্ট পাথরের পিলার সম্বলিত মসজিদটির গায়ে আরবী ভাষায় একটি শিলালিপি রয়েছে। সেনাপতি মানসিংহের অনুরোধে মুঘল সম্রাট আকবর মসজিদের নামে ১৫০ বিঘা জমি দান করেছিলেন। মসজিদের পাশেই রয়েছে বুড়াপীরের মাজার। কথিত আছে, যে ১৯ জন আওলিয়া বাংলায় এসেছিলেন তাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন বয়োজৈষ্ঠ্য। এজন্য তিনি বুড়াপীর নামে পরিচিত। তবে বুড়াপীরের দরগাহটি নির্মাণ করেছিলেন অপর এক দরবেশ।বর্তমানে প্রতিবছর মাঘ মাসের ২৯ তারিখে এখানে উরস হয়ে থাকে। [৬২]

নওগাঁ শাহী মসজিদ: পাবনার প্রাচীন গ্রাম নওগাঁ। পাঠান আমলে প্রতিষ্ঠিত এ গ্রামে অনেকগুলো প্রাচীন কীর্তির সমারোহ লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে শাহী মসজিদ (মামার মসজিদ) ভাগ্নের মসজিদ, হযরত শাহ শরীফ জিন্দানীর (র:) মাজার শরীফ এবং কয়েকটি বৃহদাকার দীঘি বিশেষভাবে স্মরণীয়। নওগাঁ শাহী মসজিদটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট। এর চার

[৫৮] ড. আয়শা বেগম, 'পাবনা জোড় বাংলা মন্দির', *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, পঞ্চদশ খন্ড, ১ম সংখ্যা, ঢাকা, জুন, ১৯৯৭ খ্রী:, পৃ: ২।

[৫৯] আব্দুল মান্নান তালূকদার, *শতবর্ষ স্মরণিকা ১৯৯০* (পাবনা: অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরী, ১৯৯১ খ্রী:), পৃ: ১৯।

[৬০] *চলন বিলের ইতিকথা*, পৃ: ২০৩।

[৬১] *বাংলা পিডিয়া*, ২য় খন্ড, পৃ: ২৮০।

[৬২] *সঙ্কলন*, পৃ: ৩৫।

কোণে চারটি সুদৃশ্য পার্শ্ববুরুজ রয়েছে। মসজিদের প্রধান গম্বুজের উচ্চতা প্রায় ২৬ ফুট, খিলানের কাজ করা। মসজিদের বাইরের দৈর্ঘ্য ৫০ ফুট, প্রস্থ ৩৩ ফুট, উচ্চতা ২২ ফুট, বারান্দার দৈর্ঘ্য ২১ ফুট, প্রস্থ ১১ ফুট। বারান্দায় দু'টি কালো পাথরের স্তম্ভ আছে। এর প্রত্যেকটির ব্যাস ৬ ফুট। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইটে নির্মিত এই মসজিদটি টেরাকোটা নকশা ও অলংকরণ সমৃদ্ধ। মসজিদের শিলালিপি থেকে জানা যায়, সুলতান নাসির উদ্দিন নুসরত শাহের আমলে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে এটি নির্মিত হয়। মসজিদের পার্শ্বে শাহ শরীফ জিন্দানীর (রঃ) এর মাজার রয়েছে।[৬৩]

ভাগ্নের মসজিদঃ নওগাঁ মসজিদের আনুমানিক ৫০০ গজ উত্তর পূর্বে একটি বড় মসজিদের ভগ্নাবশেষ আজও বিদ্যমান। এ মসজিদটি ভাগ্নের মসজিদ নামে পরিচিত। এর উপরে কোন ছাদ নেই, শুধু স্তূপকার ভূমির উপর চতুর্দিকে দেওয়াল দন্ডায়মান। ভূমি পরিকল্পনা লক্ষ্য করলে এ মসজিদে তিন সারিতে সাতটি করে মোট ২১টি গম্বুজ ছিল বলে ধারণা করা হয়। এ মসজিদে ১২টি স্তম্ভ, পূর্ব দিকে সাতটি প্রবেশপথ এবং পশ্চিম দেওয়ালে সাতটি মিহরাবের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। চারকোণে ছিল চারটি অষ্টকোণাকৃতি পার্শ্ববুরুজ। মসজিদটি বর্তমানে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে।[৬৪]

ভাড়ারা মসজিদঃ পাবনা শহর থেকে ১০ কি.মি. পূর্বে ভাঁড়ারা গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিদ রয়েছে। মসজিদ গাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায়, আসালত খাঁ নামক একজন স্থানীয় জমিদার তাঁর বাড়ির সন্নিকটে পদ্মা নদীর ধারে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে (১১৭৬ হিজরী) এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট আয়তকার এ মসজিদের পূর্ব দিকে রয়েছে তিন খিলান বিশিষ্ট প্রবেশ পথ। চারকোণে চারটি পার্শ্ববুরুজ রয়েছে, মসজিদের সম্মুখে দোচালা আকৃতির ছাদ বিশিষ্ট একটি প্রবেশ পথ রয়েছে।[৬৫]

উপসংহার

পাবনা অঞ্চল প্রাচীন ঐতিহ্যের আকরে সমৃদ্ধশালী। এ অঞ্চলে প্রাচীন কাল থেকে ঘটেছিল স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের বিকাশ, যার নিদর্শন আজও বহন করে চলেছে বিভিন্ন মসজিদ, মন্দির, দরগাহসহ প্রাচীন স্থাপনাসমূহ। এ অঞ্চলের উল্লেখিত মুসলিম পুরাকীর্তি ও নিদর্শনাবলী সমৃদ্ধ করেছে এ অঞ্চলের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে। এ সকল প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক মুসলিম নিদর্শন ছাড়াও পাবনার অন্যান্য দর্শনীয় স্থান হলো *পাবনা জর্জ কোর্ট ভবন, মানসিক হাসপাতাল, অনুকুল চন্দ্রের আশ্রম, হার্ডিঞ্জ ব্রীজ, এডওয়ার্ড কলেজ, যমুনা বহুমুখী সেতু, কুঠিবাড়ী শাহজাদপুর, চলনবিল, রায়বাহাদুরের তাড়াশ বিল্ডিং ও আজিম চৌধুরীর বাড়ী*। এগুলো কালের সাক্ষী হয়ে এ অঞ্চলের মানুষের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

---

[৬৩] *জিলা পাবনার ইতিহাস*, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৮৬; *চলন বিলের ইতিকথা*, পৃঃ ১৯৩-১৯৪।

[৬৪] *সঙ্কলন*, পৃঃ ৩৫, *জিলা পাবনার ইতিহাস*, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৮৪।

[৬৫] *বাংলা পিডিয়া*, ৫ম খন্ড, পৃঃ ৩৬৩।